# দুর্যোগে নারী ও শিশু : একটি নৃবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা

রাশেদা আখ্‌তার*

## ১. ভূমিকা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মোকাবেলায় নারীর ভূমিকা প্রসঙ্গটি উপেক্ষিত একটি বিষয়। এটি আমাদের দেশের বেলায় যেমন সত্য তেমনি উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্যি। 'দুর্যোগে নারী' প্রসঙ্গটি যেভাবে গুরুত্ব সহকারে আলোচিত ও গবেষিত হওয়া প্রয়োজন ছিল সেভাবে তা হয়নি।[১] যদিও অধুনা এ বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। বেশ কিছু গবেষণাও হচ্ছে। এমনকি বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী প্রসঙ্গটি স্থান পাচ্ছে।[২] নারীদের নিয়ে যারা গবেষণা কাজে লিপ্ত তাদেরকে মাঝে মধ্যে এমনও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে "আপনারা এত নারী নারী করছেন কেন।" বস্তুতঃ এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী অস্বাভাবিক কিছু নয়।

লেখক এ প্রবন্ধটিতে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করবে। প্রথমতঃ দুর্যোগ বলতে কি বুঝায়–তার কিছুটা ধারণা। দ্বিতীয়তঃ নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ

---

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচনা। তৃতীয়তঃ আমাদের দেশের নারীরা দুর্যোগে কেন সহজেই আক্রান্ত হয়-তার একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা। চতুর্থতঃ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশেষ করে বন্যায় নারী ও পুরুষের কর্মকাণ্ডের একটি তুলনামূলক আলোচনা। এখানে নারীদের কর্মকাণ্ডের একটি বিবরণ দেয়া হবে এবং তা কিভাবে পুরুষের চেয়ে ভিন্ন তা দেখানোর চেষ্টা করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নারীর সাথে শিশু ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই নারীর সাথে সাথে শিশুর বিষয়গুলোকে প্রবন্ধে মাঝে মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। তাছাড়া, দুর্যোগে বিভিন্ন উদাহরণের ক্ষেত্রে লেখক তার অভিজ্ঞতার ব্যাখায় চাঁদপুর জেলার মতলবের এবং জামালপুর জেলার তারাকান্দি এলাকার বন্যার বিষয়টিকে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করবে। সামগ্রিকভাবে লেখক দুর্যোগের সব বিষয়কে না দেখে আলোচনায় বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়কে বেশি প্রাধান্য দেবে। কারণ, স্বল্প আলোচনায় সব ধরনের দুর্যোগকে সমন্বিত করা সম্ভব নয়।

এ প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে তথ্যের প্রাথমিক উৎস্য হবে লেখকের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং ইতিমধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধটি মূলত: কিছু প্রাথমিক ধারণা দেয়ার নিমিত্তে লেখা। পরবর্তীতে এ বিষয়টিতে আরও তাত্ত্বিক ও নিবিড় গবেষণা করা যাবে বলে আমি মনে করি।

## ২. দুর্যোগ সম্পর্কে ধারণা

দুর্যোগ সম্পর্কে ধারণা মানুষের অজানা নয়। অতীতেও মানুষ বিভিন্ন দুর্যোগের মোকাবেলা করেছে–বর্তমানেও করছে। সাধারণভাবে দুর্যোগ বলতে বুঝায়–মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হওয়া। তবে দুর্যোগ মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনে পরিবর্তন আনে। এমনকি সমাজের কাঠামোতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। Cuny-র মতে, দুর্যোগ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের মধ্যে পরিবর্তন এনে সমাজের কাঠামোতে পরিবর্তন আনে এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নতুন সংগঠনের জন্ম হয়। এগুলো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সহায়তা করে এবং নতুন নেতার উদ্ভব ঘটে। অনেকসময় দুর্যোগের কারণে নেতার পরিবর্তনও হয়ে থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত নেতারাও অক্ষমতার পরিচয় দেয়।[৩]

Burton, Dynes, Quanantelli, White, Drabek and Cuny প্রমুখ দুর্যোগ বুঝার ক্ষেত্রে সামাজিক এবং মানুষের আচরণগত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। Dynes দুর্যোগকে সমাজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে–'সামাজিকভাবে দুর্যোগ হচ্ছে একটি ঘটনা (event) যা সময় এবং কালের (time and space) ভিত্তিতে এমন অবস্থা তৈরি করে যা কোন সমাজ কাঠামোর স্বাভাবিকতায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এছাড়া দুর্যোগের বিভিন্ন ধরন, তার কারণ, গতিবেগ, নিয়ন্ত্রণ, গতির রূপ, পূর্বসংকেতের ধরন, ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা এবং সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ধরনের হয়।[৪]

দুর্যোগের প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে সামাজিক কারণ অধিক তীব্র। কেননা, দুর্যোগ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণেই হয় না মানুষের দ্বারা সৃষ্ট কারণেও হয়ে থাকে। দুর্যোগের প্রাকৃতিক রূপ হচ্ছে–বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, নদী ভাঙ্গন, পোকার আক্রমণ ইত্যাদি। অপরদিকে মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে–অধিক গাছাকাটা, বায়ু ও পানি দূষণ, নদীর তলদেশ ভরাট, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি। তাই বলা যায় যে, দুর্যোগ হচ্ছে প্রথমত: সামাজিক ও মানবিক প্রপঞ্চ এবং দ্বিতীয়ত : প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ। কেননা, সামাজিক অসঙ্গতির কারণে প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে। তাছাড়া, দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সমাজের বিভিন্ন সংগঠন, গোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তি বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত হয়–যেখানে মানুষের মঙ্গলের ইতিবাচক দিকের চেয়ে নেতিবাচক দিকই বেশি। কেননা, দেখা যায় যে, দুর্যোগের সকলদিক অর্থাৎ পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, পূণর্গঠন সবই মানুষের স্বার্থের সাথে জড়িত। মানুষ তার নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থই অধিক চিন্তা করে। ফলে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে দুর্যোগের মোকাবেলার সুযোগ খুবই কম। তাই দুর্যোগকে সামাজিক প্রপঞ্চও বলা যায়।[৫]

### ২.১ দুর্যোগ: বাংলাদেশ

প্রায় নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক এবং মানুষের তৈরি উভয় ধরনেরই দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এর মধ্যে হচ্ছে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঘূণিঝড়, ক্ষরা, নদীভাঙ্গন, পোকার আক্রমণ, জলোচ্ছ্বাস, অধিক বৃক্ষ কাটা, বায়ু ও পানি দুষণ, প্রতিবছর নদীর তলদেশ ভরাট, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি। ১৯৬০ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে কমপক্ষে ৬৩ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে। বন্যায় প্রতি বছর দেশের

ক্ষতি হয় প্রচুর। বন্যা ছাড়া বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় দ্বারা প্রায় প্রতিবছরই বাংলাদেশ আক্রান্ত হয়। ১৯৬০ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মোট ৩৩ বার ঘূর্ণিঝড় ও সাইক্লোন দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়–তারমধ্যে ৭টি ছিল মারাত্মক ধরনের। কমবৃষ্টির কারণে প্রায় প্রতি বছরই দেশের উত্তরাঞ্চলে খরা হয়–যার ফলে স্বাভাবিক কৃষিকাজের খুব ক্ষতি হয়। পোকার আক্রমণও মাঝে মাঝে হয় যা একেবারে কম নয়। যখন পোকার আক্রমণে হাজার হাজার একর জমির ফসল আক্রান্ত হয়–তখন কৃষককুল খুবই অসহায় অবস্থায় নিপতিত হয়। এছাড়া, নদীরভাঙ্গনে বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ লোক ভিটেবাড়ি, চাষের জমি ইত্যাদি হারিয়ে উদ্বাস্তুতে রূপান্তরিত হয়।[৬] এছাড়া ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় পানি না পাওয়ায় দেশের পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মমুখীন হচ্ছে এবং দেশের উত্তরাঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

তাই দেখা যায় যে—দুর্যোগ শুধুমাত্র মানুষের জনজীবনই বিপন্ন করে না–তার সাথে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত করে। এতে অনেক মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। ফলে এ পরিবর্তন খুব গভীরভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। যেহেতু আমি দুর্যোগে দেশের সামগ্রিক রূপ না দেখে নারীর বিষয়টিকে প্রাধান্য দেবো তাই পরবর্তী অংশে আমি নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ দেখানোর চেষ্টা করবো। তাছাড়া আমার প্রবন্ধের মূল বিষয় হচ্ছে 'দুর্যোগে নারী ও শিশু'। এখানে উল্লেখ্য যে, শিশুদের বিচার করা হবে লিঙ্গ নিরপেক্ষ ভাবে। কেননা, দুর্যোগে বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আলোকে যেহেতু লিঙ্গীয় ক্ষেত্রে সামাজিক সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের রূপকে গুরুত্ব দেয়া হবে।

## ৩. নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অধিকার ও ভূমিকা পুরুষের মত সমানভাবে স্বীকৃত নয়। সমাজে নারীর ভূমিকা মূলতঃ পুরুষ কেন্দ্রিক। কেননা, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পিতা, পুত্র, স্বামী বা পুরুষই হচ্ছে পরিবারের প্রধান। তাছাড়া পিতৃতন্ত্র হচ্ছে নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ। Adrienne Rich-এর মতে –"পিতৃতন্ত্র হচ্ছে পিতার ক্ষমতা, পুরুষের পারিবারিক, সামাজিক, মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা বল প্রয়োগ–প্রত্যক্ষ চাপ বা রীতিনীতি, ঐতিহ্য, আইন ও ভাষা, প্রথা, ব্যবহার,

শিক্ষা এবং শ্রম বিভাজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেখানে নারীরা কি ভূমিকা পালন করবে বা করবে না তা নির্ধারিত হয় পুরুষ কর্তৃক এবং নারী প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুরুষের অধীন থাকে"?[৭]

সমাজের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষ উভয়েরই সৃষ্টির মধ্যে সমচিন্তা, সমকর্মকাণ্ড থাকা সত্ত্বেও নারীকে 'Second Sex' বলা হয়ে থাকে।[৮] ধরেই নেয়া হয় যে, সমাজে নারীর মূখ্যভূমিকা বা দায়িত্ব হচ্ছে তার গৃহে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিক যেমন–ব্যাকোফেন ও মগানের মতে–মানব বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃতান্ত্রিক ধারা বিদ্যমান ছিল। সেখানে পুরুষের উপর নারীর ক্ষমতা ক্রিয়াশীল ছিল। Rosaldo-এর যুক্তি হচ্ছে এ সময় নারীরা ছিল শাসক এবং পুরুষ প্রাধান্যের ধারা হিসেবে পুরুষের অগ্রগন্যতা ছিল।[৯]

লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজনের ফলে ধীরে ধীরে নারীর অবস্থান ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়। ঘরের কাজ কর্মই হচ্ছে নারীর মূখ্য কাজ। প্রাথমিক অবস্থায় এ শ্রম বিভাজন করা হয় নারী পুরুষ উভয়ের কাজের সুবিধার জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে সমাজে পুরুষ আধিপত্যের কারণে তা একতরফাভাবে ক্রিয়াশীল হতে থাকে–যার ফলে সমাজে নারীকে domestie ও পুরুষকে public এর সাথে তুলনা করা হয়।[১০] সমাজে নারী-পুরুষের মত জন্মগত ভাবে মর্যাদা সম্পূর্ণ অবস্থান পায়না, তাকে তার নিজস্ব অবস্থান তৈরি করে নিতে হয়। নারী নিজেই নিজের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব অর্জন করে। আর এসবের সূত্র ধরেই সমাজের সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গীয় সাংস্কৃতিক বিনির্মাণ (Cultural construction of gender) ক্রিয়াশীল।

### ৩.১ নারীর সামাজিক মতাদর্শগত স্বরূপ

এখন দেখা যাক, নৃবিজ্ঞানে নারী সম্পর্কিত সামাজিক মতার্দশ অর্থাৎ সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি, প্রথা কিভাবে ক্রিয়াশীল। উল্লেখ্য যে, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মতাদর্শের ধরনও ভিন্ন হয়। আর সমাজের মতাদর্শের প্রেক্ষিতে সমাজে নারীর অবস্থানের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়। নিম্নে ছকের মাধ্যমে সমাজে নারীর অভিযোজনে সামাজিক মতাদর্শ কিভাবে ক্রিয়াশীল তা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

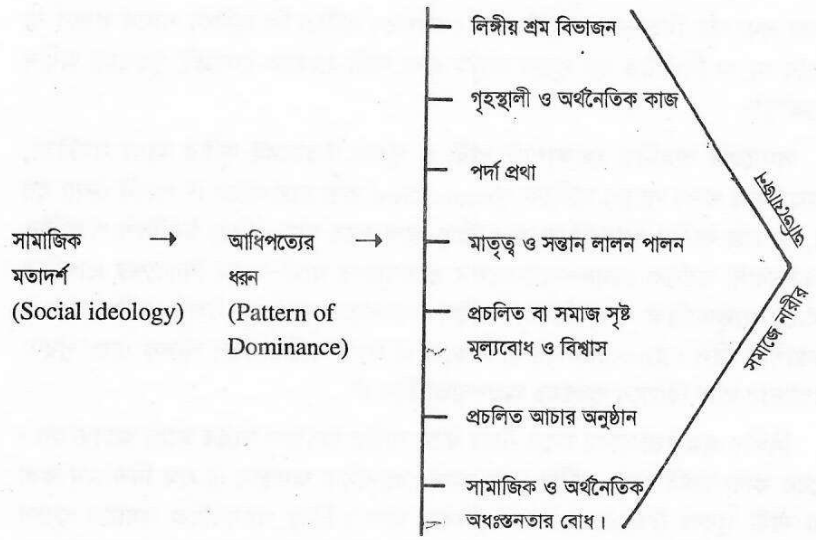


সমাজে ক্রিয়াশীল বা প্রচলিত এ সকল বোধের মধ্যেই নারীর অভিযোজন বা টিকে থাকার প্রক্রিয়া কাজ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, নৃবিজ্ঞানী Ardener সমাজে নারীকেই একমাত্র বাকশক্তিহীন গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে তিনি তাঁর (muted group) তত্ত্বে বাক শক্তিহীন বলতে সম্পূর্ণভাবে নীরব থাকাকেই বুঝায়নি বরং বুঝিয়েছেন যে, অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণার ক্ষেত্রে নারী হচ্ছে অবহেলিত। এছাড়া নারীর গৃহের কাজকে কাজ হিসেবে না দেখে বরং দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১১]

নারী শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগতভাবেই অবহেলিত নয়–Symbolic বা প্রতীকী ভাবেও নারীকে হেয় করে দেখা হয়। কেননা, বাস্তবজীবনে শুধু অশুচীর ধারণায় নারীকে নিম্নমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং আচরণগত সীমাবদ্ধতা বেঁধে দেয়া হয়। সামাজিক মতাদর্শগত ধরনের প্রেক্ষিতে পিতৃতান্ত্রিকতা ভিত্তিক রীতিনীতিতে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে জৈবিক অসমতার চেয়ে লিঙ্গীয় অসমতা বেশি ক্রিয়াশীল। যেখানে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের সাথে অন্যান্য বোধও

অসমানভাবে ক্রিয়াশীল হয়–যার ফলশ্রুতিতে পিতৃতান্ত্রিকতার পাশাপাশি মতাদর্শগত অধস্তনতা লক্ষ্য করা যায়–যাকে আমরা এভাবে সাজাতে পারি।

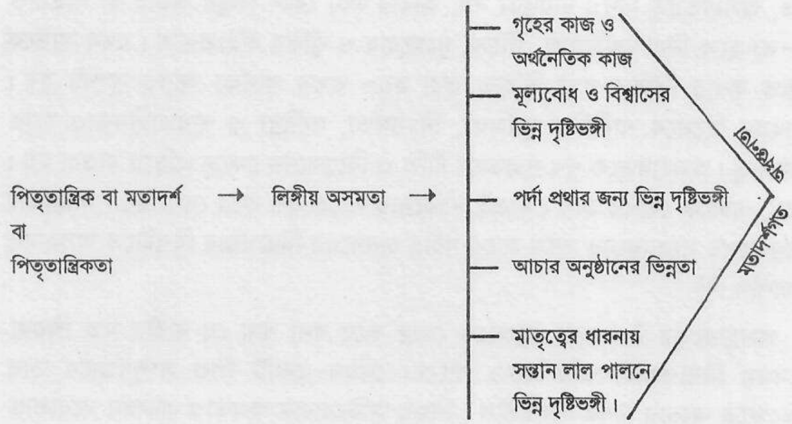


সমাজে বিদ্যমান নিয়মকানুন, রীতিনীতি, প্রথা এককথায় মতাদর্শ নারীকে অসহায় (vulnerable) করে। আর এ অসহায়ত্বের (vulnerablitiy) সূত্র ধরেই পরবর্তী অংশে আমি আমাদের দেশের নারীরা কেন দুর্যোগে অসহায়বোধ করে–তার একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করবো। কেননা, সামাজিক ভাবে লিঙ্গীয় অসমতার প্রকৃত রূপ দুর্যোগে নারীর অবস্থা ব্যাখ্যার মাধ্যমে আরও সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হবে। এখানে আমি দুর্যোগে নারীর অসহায়ত্বের বিষয় দেখানোর সাথে সাথে নারীরা সত্যিই অসহায় কিনা–নাকি সমাজের মানসিকতা তাদেরকে আরও বেশি অসহায় করছে তা দেখানোর চেষ্টা করবো।

## ৪. দুর্যোগ ও নারীর অসহায়ত্ব

### ৪.১ অসহায়ত্বের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

এখানে নারীর অসহায়ত্বকে শিশুর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কারণ, শিশু সার্বিকভাবে নারীর উপর নির্ভরশীল। ফলে নারীর প্রসঙ্গে শিশুর বিষয় ওতপ্রোতভাবে

জড়িত। অসহায়ত্ব (vulnerability) কোন আপেক্ষিক ব্যাপার নয়– তা হচ্ছে সার্বজনীন ও ব্যাপক বিষয়। Robert Chambers অসহায়ত্ব কি তা ব্যাখ্যা দেয়ার প্রসায় চালান। তিনি অসহায়ত্বকে নিরাপত্তাহীনতার সমার্থক হিসেবে দেখেন। তাঁর মতে, অসহাতয়ত্ব যদিও দরিদ্রতা নয়, আবার এটা কোন কিছুর অভাব বা পাওয়াও নয়–তা হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা, পীড়ণ, দুঃখবোধ ও ঝুঁকির বহিঃপ্রকাশ। যখন কাউকে বঞ্চিত করার বিভিন্ন পন্থা চিহ্নিত করা হয়– তখন পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট হয়। উদাহরণ হিসেবে শারীরিক দুর্বলতা, নিঃসঙ্গতা, দারিদ্র্য ও ক্ষমতাহীনতাও হচ্ছে অসহায়ত্ব। অসহায়ত্বকে খুব সুক্ষ্মভাবে নীতি ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া হয়। কারণ, এটাকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের সাথে এক করে দেখা হয়। দরিদ্রতার চূড়ান্তরূপের সংজ্ঞায়নের সাথে সাথে গরীর জনগণের নিরাপত্তার বিপরীতে অসহায়ত্ব ক্রিয়াশীল।[১২]

অসহায়ত্বের উপরোক্ত সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করে বলা যায় যে নারীর মত শিশুরা সবসময় নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকে। যেমন–একটি শিশু সম্পূর্ণভাবে তার প্রতিক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভরশীল। শিশুর অভিযোজন ক্ষমতাও একজন বয়োপ্রাপ্ত মানুষের চেয়ে অনেক কম। এক্ষেত্রে শিশুকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব হচ্ছে বড়দের যা আমাদের সমাজে শুধুমাত্র নারী বা মার উপরই পড়ে।

একই ভাবে শ্রেণীভিত্তিক সমাজে নিম্নবিত্তের মানুষ হচ্ছে অসহায়। কারণ, তাদের সমাজে ভালোভাবে জীবনযাপন করা খুবই কষ্টকর। আমরা যদি সামাজিক শ্রেণী থেকে দূরে সরে এসে একটি পরিবার কাঠামো বা সামগ্রিকভাবে একটি সমাজের দিয়ে তাকাই তবে দেখা যায় যে–আচরণ, কর্তৃত্ব, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীগত বিভাজনের সাথে সাথে লিঙ্গভেদেও ভিন্নতা দেখা যায়। ফলে এই ভিন্নতার প্রেক্ষিতেই নারী সামাজিকভাবে অসহায় হয়। আর যা দুর্যোগেও প্রভাব বিস্তার করে।

দুর্যোগে লিঙ্গভেদে নারীর অসহায়ত্ব মূল নিয়ামক হচ্ছে তার দৈহিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান-যা নাকি পুরুষের চেয়ে স্বতন্ত্র। অসহায়ত্বের উৎস্যগুলোকে আতিউর রহমান এভাবে দেখিয়েছেন ঃ যেমন : দৈহিক, সামাজিক ও অনুপ্রেরণাভিত্তিক (motivational)। দৈহিক অসহায়ত্বকে আবার তিনি স্থানভিত্তিক, বস্তুগত ও জনসংখ্যা বিষয়ক হিসেবে উল্লেখ করেন। স্থানভিত্তিক ধরনের ক্ষেত্রে অসহায়ত্বের চাপ, দখলদার নীতির কথা বলেন। আবার বস্তুগত থেকে ভূমিহীনতা,

সঙ্গীদের অভাবের কথা বলেন এবং জনসংখ্যা বিষয়ক বিষয়ে পরিবারে উপার্জনক্ষম লোকের অভাব, পুরুষ সদস্যের অন্যত্র স্থানান্তর, তালাকপ্রাপ্ত পরিত্যক্ত নারী পরিবারের প্রধান হিসেবে অসহায় হয়[১৩] সর্বোপরি দেখা যায়, পরনির্ভরশীলতা, জনসংখ্যার চাপ, সম্পদের অসমবন্টন, পরিবারে উপার্জনকারী লোকের অভাব, সংগঠনের অভাব, গণমাধ্যম, অধিক নির্ভরশীলতার কারণেও অসহায়ত্ব কাজ করে।

আলম অসহায়ত্বের বিভিন্নতাকে চার ভাবে দেখিয়েছেন। যেমন : লিঙ্গ, বয়স (দৈহিক) এথনিক ও শ্রেণীভিত্তিক। এক্ষেত্রে তিনি অসহায়ত্বের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে পুরুষ-নারী, শিশু, বৃদ্ধ, সন্তানসম্ভবা নারী, বিভাগভিত্তিক গোষ্ঠী, উপজাতীয়, ধনী-দরিদ্র হিসেবে ভাগ করেন। তবে তালাকপ্রাপ্ত, বিচ্ছিন্ন, বিধবা ও পরিত্যক্তদের তিনি একই ধরনের অসহায় হিসেবে চিহ্নিত করেন।[১৪] অর্থাৎ অসহায়ত্ব সকল ক্ষেত্রে একরূপ নয়। কেউ কম অসহায়, কেউ বেশি। আমি এক্ষেত্রে দুর্যোগে নারী ও শিশুর অসহায়ত্বকে বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

### ৪.২ নারী ও শিশুর অসহায়ত্ব ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

আমাদের দেশে নারীর অসহায়ত্বের পেছনে কাজ করে নারীর পুষ্টিহীনতা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে প্রতিকূল অবস্থার সাথে মোকাবেলা করার জন্য যেমন মানসিক শক্তির প্রয়োজন তেমনি শারীরিক শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় যে–নারী সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সংসারের কাজ করছে কিন্তু খাওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী, সন্তান, বাড়ীর মুরুব্বীদের খাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে –তা তার নিজের জন্য। এতে কখনও নারী কিছু খেতে পারে, কখনও শুধুমাত্র ভাত ছাড়া কিছুই জোটে না। এমনকি, সমাজের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বা সামাজিক মতাদর্শ হিসেবে নারী না খেয়ে স্বামীকে খাওয়াবে–তা আমাদের সমাজে ছোটবেলা থেকে মেয়ে শিশুকে শেখানো হয়। এতে নারী অল্পতেই রোগে আক্রান্ত হয়। নারী দৈহিক ভাবে দূর্বল থাকে বলে দুর্যোগ মোকাবেলায় তুলনামূলকভাবে অসুবিধায় পড়তে হয়।

মাতৃত্ব যদিও প্রাকৃতিক ব্যাপার, তথাপি সন্তান লালন পালনের প্রেক্ষিতে তা প্রাকৃতিক পর্যায়ে থাকে না। সমাজের নিয়মানুযায়ী সন্তানকে সার্বক্ষণিক দেখাশুনা করার দায়িত্ব হচ্ছে নারীর। ফলে দুর্যোগকালেও নারীর আচরণ ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ

করে সমাজের মতাদর্শ বা সামাজিক নিয়মকানুন। এক্ষেত্রে, মাতৃত্ববোধের কারণে সন্তানকে রক্ষা করতে গিয়ে নারীরা বেশি আক্রান্ত হয় এবং অনেকক্ষত্রে মৃত্যুবরণ করে। ফলে নারী অনেকক্ষেত্রে সন্তানকে নিয়ে নিজেকে খুব অসহায় মনে করে।

নারীর মধ্যে গৃহমুখীনতা কাজ করে। তাই দুর্যোগেও অনেক ক্ষেত্রে নারী নিজের ঘর ভিটা ছেড়ে কোথায়ও যাওয়ার চেয়ে ঘরে মরাও ভালো মনে করে। ফলে অনেকে দুর্যোগের সময়ও গৃহত্যাগ করে না। তাছাড়া এমনও ধারণা কাজ করে যে-গৃহস্থ হচ্ছে ঘরের লক্ষ্মী। গৃহস্থকে ঘরের মধ্যেই থাকতে হয়–দোয়া কালাম পড়তে হয়। আবার এমনও দেখা যায় যে–কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের আগে নারীরাই নিজেদের বাচ্চা ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে বের হয়ে পড়ে। যেমন–জামালপুর জেলার তারাকান্দিতে নারীরা পুরুষের আগেই বের হয়ে রেললাইনের উপর আশ্রয় নেয়। পুরুষরা শুধুমাত্র রেল লাইনের উপর থাকার মত করে ঘরের টিন বা বেড়া দিয়ে ব্যবস্থা করে দেয়। তবে বেঁচে থাকার জন্য নারীকেই সবকাজ যেমন–বাচ্চা দেখা, রান্নার ব্যবস্থা করা, খাওয়ার যোগাড় করা ইত্যাদি করতে হয়েছে। তাছাড়া, গরুছাগলগুলোকে নিরাপদ স্থানে এনেছে পুরুষরা কিন্তু তাদের দেখাশুনা করা, খাওয়ানোর চিন্তা ছিল নারীদের। তাদের মানসিকতাও ছিল–এসব দেখাশুনার দায়িত্ব নারীর। পুরুষরা কোথায় মাছ বেশি পাওয়া যায়, এ চিন্তায় ছিল বেশি তৎপর। উল্লেখ্য যে, পুরুষদের মধ্যে ওখানে একটা উৎসব উৎসব ভাব কাজ করেছে অর্থাৎ এভাবে বলা যায় যে, তারা বন্যার অবস্থা দেখা এবং মাছ ধরা নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিল। তবে তা একা না করে পুরুষরা একসঙ্গে করেছে। এখানে বন্যার সময়কালীন সমস্যাকে তারা খুব সহজেই মেনে নিতে পেরেছে। নারী ও শিশু বা সন্তান নিরাপদে আছে কিনা–এ ধরনের আশংকা পুরুষের তুলনামূলকভাবে নারীর চেয়ে কম ছিল। এক্ষেত্রে, নারী সব সময় সন্তানকে নিয়ে ছিল অসহায়। কারণ, সন্তানকে নিয়ে সব সময় নিরাপত্তাহীনতার অর্থাৎ সাপেকাটা, পানিতে পড়ে যাওয়ার ভয়ের মধ্যে থাকতে হয়েছে।

যাদের স্বামী বাড়ীতে ছিলনা সেসব মহিলারা পুরুষের জন্য অপেক্ষা না করে প্রতিবেশীদের সাথে বাড়ী থেকে বাচ্চা নিয়ে বের হয়ে পড়ে। তাছাড়া, পুরুষশাসিত সমাজের যে মতাদর্শ তা এক্ষেত্রে খুব জোরালোভাবে ক্রিয়াশীল ছিলনা। তা কঠোরভাবে ক্রিয়াশীল না থাকার পেছনে যে কারণ লক্ষ্য করা গেছে তা হচ্ছে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতাবোধ, পর্দা প্রথার শিথিলতা এবং পুরুষের বাস্তবিক

জ্ঞানবোধ। ফলে এক্ষেত্রে দেখা যায় যে-পুরুষের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে নারীর আচরণ, মানসিকতাও ভিন্ন হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, আমি এখানে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে তুলে ধরতে চেয়েছি যে-মূলতঃ নারীরা সত্যিই সব সময় অসহায় নয়, সমাজের প্রথা, রীতিনীতি এককথায় মতাদর্শ তাদেরকে অসহায় করে রেখেছে। সমাজের মতাদর্শের পরিবর্তন যে নারীর জীবনেও পরিবর্তন আনতে পারে উপরোক্ত উদাহরণ তারই ইঙ্গিত বহন করে।

বন্যায় নারীর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়। কেননা, নারীদের যখন নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করে সন্তান নিয়ে রিলিফ ক্যাম্পের মধ্যে অনেক মানুষের সাথে থাকতে হয়-তখন তাদের পক্ষে পর্দামানা সম্ভব হয় না। এমনকি খোলা জায়গায় খাওয়া, ঘুমানো, ধোয়ামোছোর কাজ করতে হয়। এতে নারীদের অসুবিধায় পড়তে হয়। যুবতী নারী ও গর্ভবতী নারীদের জন্য হয় আরও বেশি অসুবিধা। শুধু তাই নয় অনেক সময় পর্দার কারণে নারীরা রিলিফ থেকেও বঞ্চিত হয়। ফলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নারীকে আরও অসহায় করে তোলে।

আমাদের সমাজের সংস্কৃতিতে পোশাকের সাথে সম্পর্কিত করে নারীর ভাবমূর্তিকে তুলে ধরা হয়েছে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে নারীর জন্য পোশাকের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে দীর্ঘ ১২ হাত লম্বা শাড়ী। শাড়ী বন্যা বা দুর্যোগের সময় একটা বিরাট সমস্যা। কারণ, শাড়ী পড়ে সাঁতার কাটা কিংবা স্রোতের মধ্যে টিকে থাকা কষ্ট কর। নারীর পোশাক দুর্যোগে সাহায্য করার চেয়ে বরং অসুবিধাই করে বেশী। যার ফলে ঘুর্ণিঝড় বা বন্যা পরবর্তী পত্রিকার অনেক ছবিতে দেখা যায় শাড়ীর এক অংশ শরীরের সাথে জড়ানো আর বাকী অংশ গাছ বা কাঠকুটীরের সাথে জড়িয়ে আছে। ফলে পোশাকও দুর্যোগে নারীকে অসহায় করছে।

নারীরা সমাজিক কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে-তা বিবাহিত নারীই হউক আর অবিবাহিত নারীই হোক। দুর্যোগে নারী অন্যত্র স্থানান্তরিত হলে তাদের রোজগার করার মত কোন কাজ থাকে না। এরফলে বিশেষ করে অবিবাহিত নারীরা রিফুজীতে পরিণত হয়। এমনকি যৌতুকের অভাবে তাদের বিয়েও হয় না। ফলে অনেক নারী অবিবাহিত থেকে যায়। তারা নিজের জীবিকার জন্যে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে। অনেক নারী বিভিন্ন দুষ্ট লোকের খপ্পড়ে পড়ে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে। অপরদিকে বৃদ্ধ

নারীরা অসহায় অবস্থা থেকে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভিক্ষাবৃত্তিকে গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে এসব কারণে নারীরা অসহায় হয়ে পড়ছে।

দুর্যোগে অর্থাৎ ১৯৯১-এর ঘূর্ণিঝড়ে দেখা যায় যে, পুরুষ ব্যক্তিটি করুণা ভিক্ষার জন্য নারীকে সামনে ঠেলে দিয়েছে। এখানে তখন পর্দাপ্রথা বড় ব্যাপার নয় একজন পুরুষের জন্যে। কেননা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস পরবর্তীতে ত্রাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল এবং সংস্থার পক্ষ থেকে যত আবেদন জানানো হয়েছে–সব আবেদনই নারীকে সামনে রেখে। আশ্রয়-বস্ত্রের প্রয়োজন শুধু নারীর একার নয়, পুরুষেরও। কিন্তু দেখা যায় যে, সাহায্যের জন্য নারীকে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, নারীকে আশ্রয় দেবার, তার ইজ্জত বাঁচাবার আহবানের মধ্যে সমাজে নারীর অধঃস্তন অবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করা হয়--যার ফলশ্রুতিতে নারী অসহায় হিসেবে চিহ্নিত হয়।[১৫]

অর্থনৈতিক কারণ অর্থাৎ দারিদ্র্যের জন্যও নারীরা অসহায়। অসচ্ছল পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যায় দুর্যোগে বাসস্থান বা কাঁচাঘর সহজেই ভেঙ্গে যায়। এক্ষেত্রে তা নারীর অর্থনৈতিক অসহায়ত্বের পর্যায়ে পড়ে। ঘর ধসে পড়েও অনেক শিশু ও নারী মারা পড়ে। কিন্তু অবস্থাপন্ন পরিবারগুলোতে এ সমস্যা নেই। এমনকি, তালাকপ্রাপ্ত, বিধবা, বিচ্ছিন্ন, পরিত্যক্তা ও স্বামী মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে পরিবারের প্রধান হিসেবে নারীর সামাজিক দায়িত্ব চলে আসে। এরা সব সময়ই দারিদ্র্যের কারণে অসহায় থাকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুনরায় তাদের অবস্থা আরও অসহায় হয়ে উঠে।

অধিক জন্মহারও নারীর অসহায়ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। দেখা যায় যে–গ্রামীণ সমাজে বেশিরভাগ মহিলার কোলে এবং হাতে শিশু রয়েছে। অর্থাৎ অল্পবয়সের ব্যবধানে অধিক সন্তানের জন্ম। ফলে ছোট ছোট শিশুদেরকে নিয়ে দুর্যোগে নারীরা অধিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। আর শিশুরা তো সবসময়ই অসহায়। দেখা যায় যে–৩০ বৎসর পূর্বের বন্যায় যত লোক মারা গেছে–এখন তারচেয়ে অনেক বেশি লোক মারা যাওয়ার মূলে যে বিষয় ক্রিয়াশীল তা হচ্ছে— জনসংখ্যার উর্ধ্বগতি।

আমাদের গ্রামীণ সমাজে পুরুষ বিয়ে করে কাজের সন্ধানে অন্যত্র বাস করে। ফলে দুর্যোগে স্বামীর অনুপস্থিতিতে নারী বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে

পারে না। আবার, অনেক পুরুষ বাড়ীতে স্ত্রী সন্তান রেখে কাজের তাগিদে অন্যত্র বসবাস করে সেখানে আবার বিয়ে করে-ফলে নারী এক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পড়ে। তবে পূর্বের পরিবারের উপর দূর হতে নিয়ন্ত্রণ থাকে। তাদের মধ্যে এ বোধও কাজ করে যে-দুর্যোগে অন্যত্র গিয়ে থাকলে পুরুষ বাড়ীতে এসে যদি অন্যভাবে নেয়। ফলে দেখা যায় যে-ডেমোগ্রাফিক কারণেও নারী অসহায়।

সামগ্রিকভাবে নিম্নোক্তভাবে নারীর অসহায়ত্বরূপকে দেখানো যেতে পারে।

**নারীর অসহায়ত্ব**

| অসহায়ত্বের উৎস্য | প্রকাশ লক্ষণ |
|---|---|
| দৈহিক | অধিক মৃত্যু সংখ্যা<br>দুর্যোগোত্তর অসুস্থতা<br>দৈহিকভাবে নিরাপত্তাহীনতা |
| সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপ<br>বা<br>মতাদর্শগতরূপ | মাতৃত্ববোধ থেকে সন্তান লালন পালন<br>গৃহমুখীনতা<br>পুষ্টিহীনতা<br>পর্দাপ্রথা<br>সামাজিকভাবে নিরাপত্তাহীনতা<br>সমাজসৃষ্ঠ মূল্যবোধ ও বিশ্বাস |
| অর্থনৈতিক | নিরাপত্তাহীন পরিবেশে<br>বসবাস বা সমুদ্র তীরবর্তী আবাস স্থল।<br>দূর্বল বা নড়বড়ে কাঠামোর ঘরবাড়ী। |
| ডেমোগ্রাফিক | অধিক জনসংখ্যা<br>বিয়ে করে স্ত্রী রেখে চলে আসা। |

তাই বলা যায় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে লিঙ্গভেদে নারীর অসহায়ত্ব হচ্ছে মূলতঃ দৈহিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ডেমোগ্রাফিক-যা একজন পুরুষের

চেয়ে সবক্ষেত্রেই ভিন্নতর। সন্তান রক্ষার্থে পুরুষেরও দায়িত্ব আছে কিন্তু তা নারীর মত দৈহিক বন্ধনে উদ্ভূত নয়। যার ফলে মাতৃত্ব বোধের কাছে নারী যতটা দূর্বল পুরুষ পিতৃত্বের কাছে ততটা দূর্বল নয়। দেখা যায় যে, নারীর অসহায়ত্ব যতটা না দৈহিক, অর্থনৈতিক ও ডেমোগ্রাফিকভাবে ক্রিয়াশীল–তারচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল হচ্ছে সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাবে। যা মূলতঃ সমাজে প্রচলিত মানুষের মানসিকতারই নামান্তর মাত্র। আর সমাজে ক্রিয়াশীল এসব বোধই নারীকে অসহায় করছে বেশী। এক্ষেত্রে, অসহায় করার জন্য যে মানসিকতা মূলতঃ ক্রিয়াশীল তা হচ্ছে পিতৃতন্ত্র বা পুরুষ আধিপত্য ও প্রাধান্য। এক্ষেত্রে নারী সত্যিই অসহায় নয় বরং সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাই নারীকে অসহায় করছে। নারীর এ অসহায়ত্বের সূত্র ধরে পরবর্তী অংশে আমি প্রাকৃতিক দূর্যোগে, বিশেষ করে বন্যায় নারী ও পুরুষের কর্মকাণ্ডের একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। এখানে আমি নারীদের কর্মকাণ্ডের একটি বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করবো এবং তা কিভাবে পুরুষের চেয়ে ভিন্ন তা দেখানোর চেষ্টা করবো।

## ৫. দুর্যোগে নারী ও পুরুষের কর্মকাণ্ড

নারীদের কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে মূলতঃ তার গৃহ। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন নিয়মকানুন, প্রথা ও পর্দার ক্রিয়াশীলতায় কাজের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নারীর কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে অন্তর্মুখী। তাদের বড় দায়িত্ব হচ্ছে গৃহের কাজ করা, সন্তান, স্বামী ও মুরুব্বীর সেবাযত্ন করা। তাছাড়া, সমাজে নারীর কাজ—'কাজ' হিসেবে স্বীকৃত নয়–তা হচ্ছে মূলতঃ নারীর দায়িত্ব। এমনকি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নারীর কাজ সরাসরি জড়িত নয় বলে তা সবসময়ই থেকে যায় পর্দার আড়ালে বা অদৃশ্য। নারীর কাজ হচ্ছে মূলতঃ পরিবারে–যেমন: রান্নাকরা, ঘরবাড়ী ও পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার করা, বাচ্চার দেখাশুনা করা, পানি আনা, জ্বালানী সংগ্রহ করা, সজীব চাষ করা, হাঁসমুরগী, গরুছাগল লালন পালন করা, শস্য বা ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ, স্বামীর কাজে সাহায্য করা, বাড়ীতে মুরব্বী থাকলে তাদের সেবাযত্ন করা, অতিথির দেখাশুনা করা ইত্যাদি। দুর্যোগেও নারীর কাজের যে খুব একটা পরিবর্তন ঘটে তা নয়। আমি দুর্যোগে নারীর কর্মকাণ্ডের একটা বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করবো এবং তার সাথে সাথে তা পুরুষের কাজ থেকে কিভাবে আলাদা বা ভিন্ন তা দেখানোর চেষ্টা

করবো। এখানে উল্লেখ্য যে, দুর্যোগ সম্পর্কে মূলতঃ নারী ও পুরুষের উপলব্ধি এক নয়–যদিও কোন কোন বিষয়ে মিল থাকে-তবুও মতাদর্শ গত দিক থেকে যেমন তাদের কর্মকাণ্ড ও অবস্থান ভিন্ন তেমনি উপলব্ধিও ভিন্ন। তবে সামগ্রিকভাবে যে স্বরূপ দেখা যায়–তারই একটা বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করবো–যা সব এলাকার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

বিগত বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় দুর্যোগে সাধারণত আমাদের দেশের নারী ও পুরুষ উভয়েই সহজে ঘর হতে বের হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে চায়না। তবে '৮৮-এর বন্যা ও '৯১-এর ঘূর্ণিঝড়ের পর তাদের মধ্যে কিছুটা সচেতনতা কাজ করছে। দুর্যোগে নারীরা তাদের সন্তান ও খাদ্য সামগ্রী নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকে। যেমন: চাল, গম, ডাল, ধানের বীজ ঘরের উপরে মাচার সাথে বেঁধে রাখা, হাঁড়ি পাতিল যথাস্থানে রাখা, গহনাগুলো গুছিয়ে কাছে রাখা। কেননা, নারীদের একমাত্র সম্পদ ও নিরাপত্তা হচ্ছে তাদের গহনা। বিপদের সময় যেমন: সন্তান-স্বামী রোগাক্রান্ত হলে, পারিবারিক কোন বিপদ আসলে নারীরা তাদের গহনা বের করে দেয় বিক্রি করার জন্যে। হাঁস-মুরগীগুলোকে ঘরের ভেতরে এনে রাখা, রান্না করার শুকনো জ্বালানী ঘরের ভেতর রাখা। গৃহের দায়িত্বই হচ্ছে তাঁদের বড় কাজ, তাই একজন নারী গৃহের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সামলে রাখার চেষ্টা করে। অপরদিকে, পুরুষরা গরু ছাগলগুলোকে উচুস্থানে রাখার ব্যবস্থা করে। ফসলের জমির কি অবস্থা তা দেখতে তৎপর থাকে এবং ঘরকে কিভাবে বন্যার পানি থেকে রক্ষা করা যায় তার চেষ্টা করে। তবে যাদের স্বামী বাইরে চাকুরী করে, কিংবা বিধবা অথবা পরিত্যক্তা তাদের ক্ষেত্রে আবার ভিন্ন চিত্র। কারণ তাদের নিজেদেরকেই ছোট বড় সব কিছু সামাল দিতে হয়। এক্ষেত্রে, এধরনের নারীরা অন্যদের চেয়ে বেশী অসহায়। বস্তুতঃ শ্রমবিভাজনের চূড়ান্তরূপ হিসাবে নারীরা তাদের দায়িত্ব মনে করেই এগুলোকে ঠিকভাবে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কেননা, পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় জিনিস না পেলে স্বামীকে বলতে শুনা যায়, 'ঘরে বসে কি করেছো, ঠিকমতো জিনিসগুলো গুছিয়ে আনতে পারোনি।' এতসব কিছুর মাঝেও শিশু সন্তানটি তার মায়ের কোল জুড়ে থাকে। তাকে কোলে করেই নারীকে এসব কাজ সামলাতে হয়। পূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে জামালপুরের তারাকান্দিতে '৮৮র বন্যার সময় নারীদের বেঁচে থাকার সংগ্রামের ধরন। এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে নারীরাই সার্বক্ষণিক নিজেদের ও সন্তানদের রক্ষা করার চিন্তায় ব্যস্ত। এমনকি পানি যখন একটু কমে আসে তখন

রেললাইনের উপরের স্থান থেকে সাঁতার দিয়ে ডুবে যাওয়া ঘরে ি য়ে নিজেদের ও সন্তানদের প্রয়োজনীয় জিনিসও আনতে দেখা যায়। অথচ পুরুষদেরকে কলার ভেলায় চড়ে বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা, মাছমারার কাজ করা ছাড়া কিছু করতে দেখা যায়নি।

### ৫.১ নারী ও পুরুষদের কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতা ঃ মেঘনা ধনাগোদা প্রকল্প

চাঁদপুরের অদূরে বহুল আলোচিত মেঘনা ধনাগোদা বাঁধ প্রকল্পে বন্যায় নারীপুরুষের কর্মকাণ্ডের কিছু তথ্য আমার জানার সুযোগ হয়েছিল। '৮৮'র বন্যায় যখন (প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে) বাঁধ হুমকির সম্মুখীন তখন গ্রামের পুরুষ জনগণের মধ্যে এমন মানসিকতা কাজ করেছে যে বাঁধ রক্ষার দায়িত্ব শুধু পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের। দিনমুজুর হিসাবে কর্মরত ও তাদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা নিজেরা ছাড়া বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে দেখেও গ্রামের জনগণ বাঁধ রক্ষায় হাত লাগায়নি–যা আমরা ঢাকার অদূরে ডি.এন.ডি বাঁধরক্ষার ক্ষেত্রে দেখেছি। এলাকাবাসিরা বাঁধরক্ষার পরিবর্তে বরং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারিদের বাঁধভাঙ্গার সাথে সাথে মারার জন্য রামদা, লাঠি, রড নিয়ে এগিয়ে আসে–কেন তাঁরা বাঁধ রক্ষা করতে পারেনি। অপরদিকে, নারীরা 'বাঁধ হুমকির সম্মুখীন, যেকোন মুহূর্তে ভেঙ্গে যেতে পারে' একথা মাইকে শুনে নৌকায় প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, হাসমুরগী ছাগল ও সন্তানদের নিয়ে আশ্রয় নেয়। কেউ কেউ বাঁধের উপর আশ্রয় নেয়। (এখানে উল্লেখ্য যে তখন বাঁধের একাংশ ভেঙ্গেছে) অথচ পুরুষ ব্যাক্তিটি এখানে ঝামেলা বা গোলমাল করতেই ব্যস্ত। এ ঘটনা উল্লেখ করার পেছনে মূলতঃ কারণ হচ্ছে এই যে '৮৮-এর বন্যায় নারী ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের পার্থক্যকে আরও সুস্পষ্ট করা।

### ৫.২ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও পুরুষ কর্মকাণ্ড

দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ত্রাণ ও পুণর্বাসনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পুরুষ প্রধান পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষরা বিভিন্ন জায়গা থেকে রিলিফের গম, চাল, সংগ্রহ করছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষরা নিজেরা পেছনে থেকে নারীদের (শিশুকে

কোলে করে) সামনে ঠেলে দিচ্ছে–অধিক ত্রাণ বা সাহায্য পাওয়ার আশায়। তাছাড়া বাড়ীতে ফেরার পর নারী তার চুলার ব্যবস্থা করা, হাঁসমুরগী, গরুছাগলের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা, ঘরের ভিটে ঠিক করা (যেমন মাটির ভিটের ক্ষেত্রে সুন্দর করে ঘর লেপা, পাকা ভিটের ক্ষেত্রে পরিস্কার করে ধোঁয়া) জ্বালানীর ব্যবস্থা করা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা, সন্তানের যত্ন নেয়া ইত্যাদি কাজকর্মে অধিক ব্যস্ত থাকে। অপর দিকে পুরুষ ঘর মেরামত করা, নতুন ঘর তোলা, জমিতে পুনরায় বীজ বপন করা, রিলিফের খাদ্য সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া দরিদ্র কৃষক যখন দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কাজের সন্ধানে দূরে যায় পরিবার বাড়িতে রেখে তখন নারীর উপর সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখাশুনার দায়িত্ব পড়ে। বিশেষ করে তাদের প্রথমেই মৌলিক চাহিদা খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে হাঁস মুরগী অল্পদামে বিক্রি করে চালের ব্যবস্থা করতে হয়। এমনকি, আশেপাশের জায়গা থেকে কচুশাক ও অন্যান্য শাক সংগ্রহ করে রান্না করতে হয়।

মূলতঃ দুর্যোগ এবং এর পরবর্তী সময়ে কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারী উভয়েরই কাজ ও দায়িত্ব অধিক। কিন্তু বাস্তবিকভাবে দেখা যায়–নারীর কাজে গৃহস্থালী ও অ-অর্থনৈতিক হওয়ার কারণে তা অদৃশ্যই থেকে যায়। আর এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নারীকে প্রচুর কষ্ট স্বীকারও করতে হয়। তাছাড়া, আমাদের সমাজে নারীর কাজকে অবহেলা করা হয়। এমনকি নারীর কাজের জন্যে পুরুষের কাছে জবাবদিহি করতে হয়–যা পুরুষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দেখা যায় যে, দুর্যোগেও নারী ও পুরুষের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। দুর্যোগে নারী তার শিশু সন্তান নিয়ে বেশী চিন্তিত থাকে। এমনকি, পরিবারের সদস্যদের খাওয়ার ব্যবস্থা, সন্তানকে নানা বিপদে থেকে রক্ষা করা–অর্থাৎ সব মিলিয়ে নারী-পুরুষের চেয়ে বেশী অসহায়। আর বিধবা, তালাক প্রাপ্তা, পরিত্যক্তা নারী দুর্যোগে অন্যান্য নারীর চেয়ে আরও বেশী অসহায়। কারণ, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক সব ধরনের নিরাপত্তার অভাব। ফলে তারা অন্যান্যদের চেয়ে বেশী অসহায়।

### ৬. উপসংহার

এ প্রবন্ধে মূলতঃ দুর্যোগে নারী ও শিশুর বিশেষ করে নারীর অসহায়ত্বের বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কারণে দুর্যোগে

নারী পরিবারের সদস্য হিসেবে, মা হিসেবে নিরাপত্তাহীন। এক্ষেত্রে, নারী অর্থনৈতিক ও দৈহিকভাবে যতটা না অসহায় তার চেয়ে বেশি অসহায় হচ্ছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে। আর তা সমাজে ক্রিয়াশীল মতাদর্শগত বিভিন্ন রূপ-যেমনঃ পিতৃতান্ত্রিকতা, পর্দাপ্রথা, মাতৃত্ব ও সন্তান লালনপালন, সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত। বলাবাহুল্য যে, সত্যিকার অর্থে নারী সম্পূর্ণভাবে অসহায় নয়। আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সমাজের মানসিকতাই মুলত নারীকে অসহায় করছে। যা সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে ক্রিয়াশীল, দুর্যোগেও একইভাবে ক্রিয়াশীল। সর্বোপরি আমি মনে করি এ বিষয়ের উপর নৃবিজ্ঞানীদের আরও গভীর ভাবে গবেষণা করা প্রয়োজন।

## তথ্য নির্দেশিকা

১. নুরুল আলমের ১৯৯০ সনের "Annotation of Social Science Literature on Natural Disasters In Bfngladesh" এ প্রায় ২১৭ টি প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপরে Annotation–এর মধ্যে দেখা যায় যে, দুর্যোগে নারী বিষয়ক কোন আলাদা কাজ বা চিন্তাভাবনা হয়নি। বরং দুই একটা লেখায় দুর্যোগে নারী বিষয়ক কিছু তথ্য সম্পর্কে স্বল্প পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া R.N Mathur and Monica Mathur তার ক্ষুদ্র রচনায় দুর্যোগে নারীর সাড়া ও প্রতিক্রিয়ার কিছু রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তবে তা খুবই সামান্য।

২. মাহবুবা বেগম 'Response To Natural Disaster : A Study of Survival Strategies of Rural Women In Coping with Floods In Bangladesh-এর উপর উচ্চতর গবেষণা করেছেন। তাছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী গবেষণা পত্র হিসেবে কিছু কাজ সম্পন্ন করেছে।

৩. Cuny Frederick c. 1993. Disasters and Development, Oxford Universty Press, New York and Oxford, P. 278.

৪. United Nations 1986, Social and Sociological Aspects : Disaster Prevention and Mitigation, Vol. 12, A Compendium of Current Knowledge, P. 48.

৫. Alam, S.M. Nurul, 1992, Training Materials on Disaster Reduction : Human Behavioural Issues-A Social Development Compendium, A report submitted to UNESCO for a Project on Disaster Training, P. 7.

৬. Alam, S. M. Nurul, 1990, Annotation of Social Science Literature on Natural Disasters In Bangladesh Produced by PACT Bangladesh / PRIP in Collaboration with ADAB, P. 182.

৭. Rich Adrienne. 1976, Of Women Born : Motherhood as Experience and Iustitution, New York, W . W. Nortou, P. 57.

৮. Rosaldo, M. Z. and Lawphere, L. 1974, "Introduction" In Woman, Culture and Society (eds) M. Z. Rosalde and L. Lanphere, Stanford Uneversity Press, P. 2.

৯. বিস্তরিত দেখুন Sacks, K., 1975, Eugesl Revisited : women the organization of Production and Private Property" In Towand An Authropology of Women (ed) R. R. Reiter, New York, Monthly Review Press, PP 211- 234.

১০. Rosaldo- Domestic কে এক বা একাধিক মা ও সন্তানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে বুঝিয়েছেন এবং Public কে বুঝিয়েছেন-প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্পর্কযুক্ত মর্যাদা সম্পন্ন সংগঠন। বিস্তারিত দেখুন- Rosaldo M.Z. 1974, "Woman, Culture and Society : A Theoretical Overview", In woman, Culture and Society (eds) M.Z. Rosaldo and L. Lanphere, Standford University Press, P. 23.

১১. Moore, H. L., 1989, Feminism and Anthropology, Cambridge, U. K. Polity Press. P. 4.

১২. Alam, S. M. Nurul,1992, পূর্বোক্ত, P. 34.

১৩. বিস্তারিত দেখুন, Rahman, Atiur, 1992, Disaster and Development : A Study in Institution Building in Bangladesh, Grass Roots an Alternative Development Journal, An ADAB Quarterly, P.36.

১৪. Alam, S. M. Nurul, 1992, পূর্বোক্ত P.38.

১৫. হাস্নাহেনা, ঘুর্ণিঝড় ২৯ শে এপ্রিল ৯১ ঃ প্রেক্ষিত নারী, দৈনিক সংবাদ, ১৯ শে নভেম্বর, ১৯৯১ ইং।